দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ
চৈত্র, ১৯৭১

প্রকাশক ঃ
গোলাম ফারুক
প্রগতি প্রকাশনী
১৪৪ নিউ মার্কেট
ঢাকা ৫

প্রচ্ছদ ঃ
কাইয়ুম চৌধুরী

মুদ্রক ঃ
নাজির খসরু
রূপক মুদ্রায়ণ
১৩৫ হৃষিকেশ দাস রোড
ঢাকা ১

উৎসর্গ

শামসুর রাহমান
ফজল শাহাবুদ্দীন
শহীদ কাদরী

আমাদের এককালের সখ্য ও সাম্প্রতিক কাব্যহিংসা অমর হোক।

লেখকের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ :

লোক লোকান্তর
কালের কলস
মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো
অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না
বখ্‌তিয়ারের ঘোড়া

প্রকৃতি

কতদূর এগোলো মানুষ !
কিন্তু আমি ঘোরলাগা বর্ষণের মাঝে
আজও উবু হয়ে আছি। ক্ষীরের মতন গাঢ় মাটির নরমে
কোমল ধানের চারা রুয়ে দিতে গিয়ে
ভাবলাম, এ-মৃত্তিকা প্রিয়তমা কিষাণী আমার।
বিলের জমির মত জলসিক্ত সুখদ লজ্জায়
যে নারী উদাম করে তার সর্ব উর্বর আধার।

বর্ষণে ভিজছে মাঠ। যেন কার ভেজা হাতখানি
রয়েছে আমার পিঠে। আর আমি
ইন্দ্রিয়ের সর্বানুভূতির চিহ্ন ক্ষয় করে ফেলে
দয়াপরবশ হয়ে রেখেছি আমার কালো দৃষ্টিকে সজাগ।

চতুর্দিকে খনার মন্ত্রের মত টিপ টিপ শব্দে সারাদিন
জলধারা ঝরে ! জমির কিনার ঘেঁষে পলাতক মাছের পেছনে
জলডোরা সাপের চলন নিঃশব্দে দেখছি চেয়ে।
বাহুতে আমার
আতঙ্কে লাফিয়ে উঠছে সবুজ ফড়িং।

বুঝিবা স্বপ্নের ঘোরে আইল বাঁধা জমিনের ছক
বৃষ্টির কুয়াশা লেগে অবিশ্বাস্য যাদুমন্ত্রবলে
অকস্মাৎ পাল্টে গেলো। ত্রিকোণ আকারে যেন
ফাঁক হয়ে রয়েছে মৃন্ময়ী।
আর সে জ্যামিতি থেকে
ক্রমাগত উঠে এসে মাছ পাখি পশু আর মানুষের ঝাঁক
আমার চেতনা জুড়ে খুঁটে খায় পরস্পর বিরোধী আহার।

বাতাসের ফেনা

কিছুই থাকে না দেখো, পত্র পুষ্প গ্রামের বৃদ্ধরা
নদীর নাচের ভঙ্গি, পিতলের ঘড়া আর হুঁকোর আগুন
উঠতি মেয়ের ঝাঁক একে একে কমে আসে ইলিশের মৌসুমের মত
হাওয়ায় হলুদ পাতা বৃষ্টিহীন মাটিতে প্রান্তরে
শব্দ করে ঝরে যায়। ভিনদেশী হাঁসেরাও যায়
তাঁদের শরীর যেন অর্বুদ বুদ্বুদ
আকাশের নীল কটোরায়।

কিছুই থাকে না কেন ? করোগেট, ছন কিংবা মাটির দেয়াল
গাঁয়ের অক্ষয় বট উপড়ে যায় চাটগাঁর দারুণ তুফানে
চিড় খায় পলেস্তরা, বিশ্বাসের মতন বিশাল
হুড়মুড় শব্দে অবশেষে
ধসে পড়ে আমাদের পাড়ার মসজিদ !

চড়ুইয়ের বাসা, প্রেম, লতাপাতা, বইয়ের মলাট
দুমড়ে মুচড়ে খসে পড়ে। মেঘনার জলের কামড়ে
কাঁপতে থাকে ফসলের আদিগন্ত সবুজ চিৎকার।
ভাসে ঘর, ঘড়া-কলসী, গরুর গোয়াল
বুবুর স্নেহের মত ডুবে যায় ফুল তোলা পুরনো বালিশ।
বাসস্থান অতঃপর অবশিষ্ট কিছুই থাকে না
জলপ্রিয় পাখিগুলো উড়ে উড়ে ঠোঁট থেকে মুছে ফেলে বাতাসে ফেনা।

দায়ভাগ

ভোলো না কেন ভুলতে পারো যদি
চাঁদের সাথে হাঁটার রাতগুলি
নিয়াজ মাঠে শিশির-লাগা ঘাস
পকেটে কার ঠাণ্ডা অঙ্গুলি
চুকিয়ে হেসে বলতে, অভ্যাস;

বকুলডালে হাসতো বুলবুলি।

মোছো না কেন মুছতে পারো যদি
দেয়ালে কালো অঙ্গারের দাগ,
রঙ্গভরে ফোটাতে মুখ যার
ভাবনা ছিলো করবো কিনা রাগ
কণ্ঠা বেয়ে কাঁপতো সরু হার;

খেলার বুঝি থাকে না দায়ভাগ?

তোমার ছাদে ওঠে তো গোল চাঁদ
সাহস থাকে ডাকো না জ্যোস্‌নাকে
হাসের খেলা ভসায় ভরা নদী;
কাটো না জল যদি বা দোষ থাকে;
রক্তলোভী আলোছায়ার ফাঁদ –

ভাঙো না কেন ভাঙতে পারো যদি।

কবিতা এমন

কবিতা তো কৈশোরের স্মৃতি। সে তো ভেসে ওঠা ম্লান
আমার মায়ের মুখ; নিম ডালে বসে থাকা হলুদ পাখিটি
পাতার আগুন ঘিরে রাতজাগা ছোট ভাই-বোন
আব্বার ফিরে আসা, সাইকেলের ঘন্টাধ্বনি—রাবেয়া রাবেয়া—

আমার মায়ের নামে খুলে যাওয়া দক্ষিণের ভেজানো কপাট!
কবিতা তো ফিরে যাওয়া পার হয়ে হাঁটুজল নদী
কুয়াশায়-ঢাকা পথ, ভোরের আজান কিংবা নাড়ার দহন
পিঠার পেটের ভাগে ফুলে ওঠা তিলের সৌরভ
মাছের আঁশটে গন্ধ, উঠোনে ছড়ানো জাল আর
বাঁশঝাড়ে ঘাসে ঢাকা দাদার কবর।

কবিতা তো ছেচল্লিশে বেড়ে ওঠা অসুখী কিশোর
ইস্কুল পালানো সভা, স্বাধীনতা, মিছিল, নিশান
চতুর্দিকে হতবাক দাঙ্গার আগুনে
নিঃস্ব হয়ে ফিরে আসা অগ্রজের কাতর বর্ণনা।

কবিতা চরের পাখি, কুড়ানো হাঁসের ডিম, গন্ধভরা ঘাস
ম্লানমুখ বউটির দড়ি ছেঁড়া হারানো বাছুর
গোপন চিঠির প্যাডে নীল খামে সাজানো অক্ষর
কবিতা তো মক্তবের মেয়ে চুলখোলা আয়েশা আক্তার।

আসেনা আর

পাহাড়পুরের পাথর রেখে বামে
পেরিয়ে খাল, পুরনো গড়খাই
এগোলে কেউ আসে না আর ঘরে
এই কথা তো জানতে, তবু কেন
হাটের মাঝে আসতে দিয়েছিলে ?

তোমার শিকায় রঙ মাখাতো যারা
তোমায় এনে দিতো মোরগফুল
তাদের হাত ফেরালে একবার
কখনো তারা আসে না আর গাঁয়ে
সেই কথা তো জানাই ছিল, তবু
বানের জলে ভাসতে দিয়েছিলে !

তোমায় যারা বলতো যাদুকরী,
তোমায় যারা ডাকতো কালোসাপ,
যাদের দেখে ভাঙে কাঁখের ঘড়া,
যাদের ভয়ে মুখ লুকাতে জলে,
দীঘির পাড়ের অন্ধ জনরবে
তখন কেন হাসতে দিয়েছিলে ?

অবগাহনের শব্দ

জানি না কি ভাবে এই মধ্যযামে আমার সর্বস্ব নিয়ে আমি
হয়ে যাই দুটি চোখ, যেন জোড়া যমজ ভ্রমর পাশাপাশি
বসে আছে ঈষদুষ্ণ মাংসের ওপর।

চেতনাচেতনে যেন হেঁটে যায় অন্ধকার। সাপের জিহ্বার মত দ্রুত
কম্পমান
অনুভূতি ছুঁয়ে যায় এলোমেলো রক্তের পর্দায়।
আমার সমস্ত মর্মে যেন এক বালকের বিদায়ের বিষণ্ণ লগন
লেগে থাকে। সর্বশেষ আহার্যের থালা থেকে উষ্ণ গন্ধময়
ধোঁয়া হয়ে উড়ে এসে নাকে লাগে মায়ের আদর।

বিদায়, বিদায় দাও হে দৃশ্য, হে জন্মান্ধ পশ্চাৎ
আর কেন লগ্ন হও, অন্ধকার হয়ে থাক গাছপালা বাসস্থান নদী
পাখির ডাকের মত অন্তর্হিত হয়ে যাও অমলিন গভীর সবুজে।

নদীর শরীর ঘেঁষে যেতে যেতে চেয়ে দেখি ওপারে হঠাৎ
আলোর গোলক হয়ে উঠলেন দিনের শরীর।
অবগাহনের শব্দে ছল ছল ঘাটের পৈঠায়
কে যেন বললো স্নেহে সঙ্গিনীকে,
চেয়ে দেখ্ অই
কোন মা মাঘের ভোরে প্রাণ ধরে ছেড়েছে এমন
দুধের দুলাল তার। কুয়াশায় হেঁটে যাচ্ছে, আহা কি কষ্টের।

পাখি ওড়া দেখা আর হেঁটে যাওয়া নদীর পেছনে দিনমান
যেন আর খেলা নয়। ঘাম জমে ললাটে চিকন
হাঁটুতে ধুলোর দাগ। হাত তুলে আলোকে আড়াল
এখন হবে না আর। তুঙ্গ হয়ে দিনের দেবতা অগ্নিময় আকাশে
গেলেন।

আবার জলের শব্দে চেয়ে দেখি, অবগাহনের পালা
ঘাটময় গ্রামের মেয়েরা আমারে দেখিয়ে বলে, কে অই পুরুষ যায়
কোন গাঁয় জানি কোন রূপসীর ঘরে।

তৃষ্ণা মরে গেলে পরে স্বেদবিন্দু সন্ধ্যার হাওয়ায়
কখন শুকায় ফের। চরের পাখিরা
মুখ চাওয়াচাওয়ি করে অবশেষে উড়ে যায় রক্তাভ ডানায়।

বড় অবসাদ লাগে। দুঃখ নয় বাঞ্ছা নয় বুঝি কোন পিপাসা আমাকে
করে না তাড়না আর। কোন ঘাটে এসেছি জানি না
অষ্টাদশ কলসী নিয়ে ঘরে ফিরে বধূরা এখন।
কে নারী বললো বড় গাঢ় স্বরে, পার হয়ে অন্ধকার বিল
না জানি কোথায় যাবে এই বৃদ্ধ পথিক পুরুষ।

এই সম্মোহনে

তোমার জন্যে লোকালয়
হেঁটে এসে আজো কড়া নাড়ি,
তোমার জন্যে করি জয়
অভাবের ক্ষিপ্ত তরবারি।

তুমি আছো এই সম্মোহনে
খুলতে যাই মৃত্যুর তামস,
অবারিত চুম্বনে, গুঞ্জনে
ধরে থাকি তোমাকে, অবশ।

সবুজ গন্ধের এক গাছ
যেন আমি; স্ফটিকের ঘর,
কাঁচের আধারে কালো মাছ
মুখে নেয় সোনালি পাথর।

এ্যাকুরিয়ামের মতো ছোট
স্বচ্ছ শাদা সংসার আমার,
কে মৎসিনী দীপ্ত হয়ে ওঠো
ছলকে নীল জলের আঁধার?

ক্ষুধার্ত এ মুখ তুলে যত
বাতাসের বিন্দু আনা যায়,
এ মহার্ঘ বুদ্বুদ কহ তো
রাখবে কোন শৈবালের গায়?

শব্দহীন ভুরভুরির গতি
হয়ে যায় আনন্দের ফুল
খায় এক মাছের যুবতী
ঠুকরে খায়, আমার আঙুল।

প্রত্যাবর্তনের লজ্জা

শেষ ট্রেন ধরবো বলে এক রকম ছুটতে ছুটতে স্টেশনে পেঁাছে দেখি
নীলবর্ণ আলোর সংকেত। হতাশার মতোন হঠাৎ
দারুণ হুইসেল দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে।
যাদের সাথে শহরে যাবার কথা ছিল তাদের উৎকণ্ঠিত মুখ
জানালায় উবুড় হয়ে আমাকে দেখছে। হাত নেড়ে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

আসার সময় আব্বা তাড়া দিয়েছিলেন, গোছাতে গোছাতেই
তোর সময় বয়ে যাবে, তুই আবার গাড়ি পাবি।
আম্মা বলছিলেন, আজ রাত না হয় বই নিয়েই বসে থাক
কত রাত তো অমনি থাকিস।
আমার ঘুম পেলো। এক নিঃস্বপ্ন নিদ্রায় আমি
নিহত হয়ে থাকলাম।

অথচ জাহানারা কোনদিন ট্রেন ফেল করে না। ফরহাদ
আধ ঘণ্টা আগেই স্টেশনে পেঁাছে যায়। লাইলী
মালপত্র তুলে দিয়ে আগেই চাকরকে টিকিট কিনতে পাঠায়। নাহার
কোথাও যাওয়ার কথা থাকলে আনন্দে ভাত পর্যন্ত খেতে পারে না।
আর আমি এঁদের ভাই
সাত মাইল হেঁটে এসে শেষ রাতের গাড়ি হারিয়ে
এক অখ্যাত স্টেশনে কুয়াশায় কাঁপছি।

কুয়াশার শাদা পর্দা দোলাতে দোলাতে আবার আমি ঘরে ফিরবো।
শিশিরে আমার পাজামা ভিজে যাবে। চোখের পাতায়
শীতের বিন্দু জমতে জমতে নির্লজ্জের মতোন হঠাৎ
লাল সূর্য উঠে আসবে। পরাজিতের মতো আমার মুখের উপর রোদ
নামলে, সামনে দেখবো পরিচিত নদী। ছড়ানো ছিটানো
ঘরবাড়ি, গ্রাম। জলার দিকে বকের ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে। তারপর

দারুণ ভয়ের মতো ভেসে উঠবে আমাদের আটচালা।
কলার ছোট বাগান।
দীর্ঘ পাতাগুলো না না করে কাঁপছে। বৈঠকখানা থেকে আব্বা
একবার আমাকে দেখে নিয়ে মুখ নিচু করে পড়তে থাকবেন
ফাবি আইয়ে আলা ই-রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান.........।

বাসি বাসন হাতে আম্মা আমাকে দেখে হেসে ফেলবেন।
ভালোই হলো তোর ফিরে আসা। তুই না থাকলে
ঘরবাড়ি একেবারে কেমন শূন্য হয়ে যায়। হাত মুখ
ধুয়ে আয়। নাস্তা পাঠাই।
আর আমি মাকে জড়িয়ে ধরে আমার প্রত্যাবর্তনের লজ্জাকে
ঘষে ঘষে
তুলে ফেলবো।

পলাতক

পলাতক বলে লোকে, বুকে বড় বাজে। আমি তো এখনো
জীবনের জলাধারে হতে চাই তুমুল রোহিত।
কোথায় পালাবো আমি, যেখানে রাতেও
নারীর নিঃশ্বাস এসে চোখে মুখে লাগে। বুকে লেগে থাকে ক্লান্ত
শিশুর শরীর, বলো,
পালাবো কোথায় ?

জীবনের পক্ষে তাই সারাদিন দরজা ধরে থাকি।

সকালে খোয়াড় থেকে মুরগীর বাচ্চাগুলো রোজ
সুন্দর শব্দ করে পাকালের প্রান্তে চলে গেলে
আমি তাড়াতাড়ি উঠে
হাত দিয়ে ঢেকে রাখি আগুনের মুখ।

সোনালি শঙ্খের লোভে জলদাসদের সেই একরত্তি মেয়ে
অকস্মাৎ সমুদ্রের ঢেউয়ে আটকে গেলে
আমি কি নির্ভয়ে
বঙ্গোপসাগরের জলে নামিনি একাকী ?

আর্শোলার অত্যাচারে তিক্ত হতে হতে
আমার রূপসী যবে পতঙ্গের গুষ্ঠিশুদ্ধ থেতলে দিতে যায়
শাড়ির প্রশংসা করে আমি কি তখন তারে প্রসন্ন করি না !

স্বপ্নের সানুদেশে

একদা এক অস্পষ্ট কুয়াশার মধ্যে আমাদের যাত্রা
তারপর দিগন্তে আলোর ঝলকানিতে আমাদের পথ
উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। বাতাসে ধানের গন্ধ,
পাখির কাকলিতে মুখরিত অরণ্যানী।
আমাদের সবার হৃদয় নিসর্গের এক অপরূপ ছবি হয়ে
ভাসতে লাগলো।

নদী, নদী--
সন্তানেরা উল্লসিত আনন্দের মধ্যে আঙুল তুলে
যে স্পষ্ট জলধারা দেখালো, তা আমাদের প্রাণ।
এই সেই স্রোতস্বিনী, যার নকশায় আমাদের রমণীরা
শাড়ি বোনেন। ঐ সেই বাঁক যার অনুকরণে
আমার বোনেরা বঙ্কিম রেখায় এঁটে দেহ আবৃত করেন।
দেখো সেই পুণ্যতোয়া,
যার কলস্বর আমাদের সংগীতে নিমজ্জিত করে।
দেখো, দেখো।

আমরা যেখানে যাবো, সেই বিশাল উপত্যকার ছবি
আমাদের সমস্ত অন্তরকে গ্রাস করে আছে। আমাদের পতাকায়
রূপকথার বাতাস ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যৎ
আমাদের আশাকে দোলাচ্ছে সোনালি দোলকের মতো,
বার বার।

আনন্দে আপ্লুত হয়ে আমরা স্বপ্নের দিকে
রওনা দিয়েছি। দুঃখ
আমাদের ক্লান্ত করে না।
দুর্যোগের রাতে আমরা এক উজ্জ্বল দিনের দিকে

মুখ ফিরিয়েছি। বিঘ্ন
আমাদের বিবশ করেনি।

চীৎকার, কান্না ও হতাশার গোলকধাঁধা ছেড়ে
আমরা বেরিয়ে যাবো। মৃত্যু
আমাদের স্পর্শ না করুক।

স্বপ্নের সানুদেশে আমরা শস্যের বীজ ছড়িয়ে দেবো
বাম দিকে বয়ে যাবে রুপোলি নদীর জল, ডানে
তীক্ষ্ণ তৃষিত পর্বত।

তোমার হাতে

তোমার হাতে ইচ্ছে করে খাওয়ার
কুরুলিয়ার পুরনো কই ভাজা;
কাউয়ার মতো মুন্সী বাড়ির দাওয়ায়
দেখবো বসে তোমার ঘষা মাজা।

বলবে নাকি, এসেছে কোন গাঁওয়ার ?

ভাঙলে পিঠে কালো চুলের ঢেউ
আমার মতো বোঝেনি আর কেউ,
তবু যে হাত নাড়িয়ে দিয়ে হাওয়ায়
শহরে পথ দেখিয়ে দিলে যাওয়ার।

অন্তরভেদী অবলোকন

কাল মৃত্যু হাত বাড়িয়ে ছিলো আমার ঘরে। জানলার
ফাঁক দিয়ে সেই দীর্ঘ হাত অন্ধের অনুভব শক্তির মত
বিছানার ওপর একটু একটু এগোলো। আমার স্ত্রী শিশুটির
মাথায় পানির ধারা দিচ্ছিলেন। তার চোখ ছিলো পলকহীন, পাথর।
স্তন দুটি দুধের ভারে ফলের আবেগে ঝুলে আছে।
পানির ধারা প্রপাতের শব্দের মত হয়ে উঠে সবকিছুতে
কাঁপন ধরিয়ে দিলো। লন্ঠনের আলো ময়ূরের পালকের
অনুকরণে কাঁপতে লাগলো। অবিকল।

আর সেই হাত, বালিশের কাছে এসে পড়েছে, আমি
দেখলাম। স্ফীত শিরা, নখ কাটা হয়নি। রোমশ।
আমার চিৎকার করতে ইচ্ছে হলো। কিন্তু মৃত্যুর সামনে আমি
কোনদিন শব্দ করতে পারি না।
সেই হাত ঝাপটে ধরতে ক্রোধ হলো। কিন্তু মৃত্যুর শক্তি
সম্বন্ধে আমি জানতা, আমার ধারণা ছিল।
তবে কি প্রার্থনা করবো ? না, মৃত্যু তো চেঙ্গিসের
অশ্বের মতো দ্রুতগামী, বধির।

—কে ? কে ?
জলের ধারা থমকে গেল। আমার স্ত্রী চোখ তুলে
তাকালেন। তার নগ্ন হাতে শূন্য জলপাত্র। ব্লাউজের বোতাম
খুলে গিয়ে 'ম'-এর আকারের মত কন্ঠা উদোম হয়ে আছে।
নির্জল চোখে অন্তরভেদী অবলোকন।
আমি মৃত্যুর দিকে তাকালাম। দেখি, কুকুরের লেজের
মত সে জানলার দিকে গুটিয়ে যাচ্ছে। নখ কাটা হয়নি,
স্ফীতশিরা রোমশ।

যার স্মরণে

স্মরণে যার বুকে আমার জলবিছুটি
আমার ঘরে রাখলো না সে চরণ দু'টি।
ধানের সবুজ করলো কি যে আড়াল দিয়ে
যাসনে মেয়ে, মন্ত্র দিলো বনের টিয়ে।
নাওয়ের বাদাম ডাকলো তারে; চরের মাটি
আদর করে বিছিয়ে দিলো শীতলপাটি;
ভয় ধরিয়ে ডাকলো হুতোম ছাতিম গাছে
বন্য বাতাস কাঁপলো এসে বুকের কাছে।
পাতার ফাঁকে রাত্রি যখন নামলো সেজে
সেই যুবতীর বাংড়ি হাতে উঠলো বেজে।
হঠাৎ নদী ধরলো এসে সাপের ফণা
হাওয়ার আঘাত করলো তারে অন্যমনা।
খোঁপার বাঁধন ভাঙলো যখন যত্নেগড়া
ব্যর্থ হলো আমার সকল মন্ত্রপড়া।

নতুন অব্দে

ভাতের গন্ধ নাকে এসে লাগে ভাতের গন্ধ
জেগে উঠতেই চারিদিকে দেখি, দুয়ার বন্ধ।
দ্বার খোলবার সাহসে যখন শরীর শক্ত
হঠাৎ তখুনি মহতেরা বলে লোকটা অন্ধ;

বুকের অতলে লাফায় নীরবে আহত রক্ত।

ধানের স্বপ্ন দু'চোখে আমার, এই নগণ্য—
দাবী তুলতেই কারা বলে ওঠে বন্য, বন্য।
ধান তোলবার অস্ত্র নিলাম বিপুল শব্দে।
হঠাৎ তখুনি মনীষীরা বলে এ-ও জঘন্য।

তবু তো সূর্য উঠে আসে দেখি নতুন অব্দে।

স্বপ্নে আমায় ডেকে ওঠে এক সুখের পক্ষী
ঘুম ভেঙে আজ চলেছি তাহার কূজন লক্ষ্য
কতদূর গেলে পাওয়া যাবে সেই নীল বিহঙ্গ
আমি হতে চাই দিনমান তার শরীর রক্ষী।

তারে নিরালায় পেতে দিতে চাই আমার অঙ্গ।

আমিও রাস্তায়

অসংখ্য চক্ষু যেন ঘিরে ফেলবে এখুনি আমাকে
শস্যের সবুজ থেকে ক্রমাগত উঠে এসে গোসার গোঙানি
কারোগেটে ঢেউ তুলে চাবকে দেবে আমাকে নির্মম।
তন্নতন্ন দেখে নেবে বাসন কোশন
পুঁথিপত্র ছারখার ছড়িয়ে চৌদিকে
শিকার পাইলা খুলে দেখবে নেই, ভাত বা সালুন।

কইরে হারামজাদা, দেখুম আজকা তর হুগল পুংটামি
কোনখানে পাড়ো তুমি জবর সোনার আন্ডা, কও মিছাখোর ?
বলেই টানবে লেপ তারপর তাজ্জবের মতো
পেথম উদাম করে দেখবে এক বেশরম কাউয়ার গতর।

গালি-গালাজের ঢেউ টলমলায় আমার উঠোনে
আমারে ভাসিয়ে নেয় খাদ্যলোভী ক্ষোভের কাতারে
সাপের অঙ্গের মতো ভঙ্গি ধরে, টান মারে, মিছিলে রাস্তায়।

সাহস দেখো না মিয়া, শহরে আগুন দিতে আহে ঐ
বে-তমিজ গাঁওয়ের পোলারা।

দিলো বাইন্ধা পথঘাট, বাস গাড়ি মোটর দোকান
গোলমালের কারিগর ইটা মারে মরুব্বির গায়।
সাহস দেখো না মিয়া, বে-তমিজ বান্দীর পুতেরা
মাইনষের লওয়ের মতো হাঙ্গামার নিশান ওড়ায়।

পালক ভাঙার প্রতিবাদে

আমি যেন সেই পাখি, স্বজন পীড়নে যারা
কালো পতাকার মতো হাহাকার করে ওঠে, কা-কা
আর্তনাদে ভরে দেয় ঘরবাড়ি, পালক ভাঙার
উপায়বিহীন প্রতিবাদে
        আকাশ কাঁপিয়ে কাঁদে।
        ছত্রখান হয়ে উড়ে উড়ে
ঘুরে ঘুরে পাখসাটে
        পিষ্ট প্রায় সঙ্গীর দশায়।

এমন রোদন ধ্বনি কেন আজ বেজে ওঠে ?
        এইতো সেদিনও
বোস্তামীর পুকুরের ঘোলা-ময়লা জলের কাছিম
হওয়ার সাধনা ছিলো, টকটকে লাল
মাংসের মন্ডের মতো লোভ এসে ছিটকে পড়তো
থকথকে সিঁড়িতে সারাদিন।

আজ যেনো ভেঙে গেলো দারুণ খোলস, খুলে গেলো যেন
আমার কঠিন প্রাণ। রহস্যের ময়লা কালো জলে
অজস্র সফেদ ফিটকিরি ইতস্ততঃ ছুঁড়ে দিয়ে কেউ
সহসা ধরিয়ে দিলো কম্পমান পানির পাতালে
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেঙে যাওয়া নির্বোধের মুখচ্ছবিখানি।

এ মুখ আমার নয়, এ মুখ আমার নয়, বলে—
যতবার কেঁপে উঠি, দেখি,
আমার স্বজন হয়ে আমার স্বদেশ এসে
দাঁড়িয়েছে পাশে। নির্ভয়ে, আশ্বাসে
জিয়ল মাছের ভরা বিশাল ভান্ডের মতো নড়ে ওঠে বুক :

ব্যাকুল মুখের সারি ক্ষমার সুরভি নিয়ে আজ
হঠাৎ ফোটালো এক রক্তবর্ণ শতমুখী ফুল।
কাতারে কে ডাকে নাম ধরে ? আদেশের গম্ভীর নিনাদে
আমার নামের ধ্বনি আমারই শরীর ঘিরে ঘিরে
ঝিঁঝির শব্দের মতো ঢুকে গেলো গ্রামের ভিতর।

মনে হলো, ডাক দিলে জড়ো হয়ে যাবে সব নদীর মানুষ
অসংখ্য নাওয়ের বাদাম মুহূর্তে গুটিয়ে ফেলে রেখে
জমা হয়ে যাবে এই চরের ওপর।
খেতের আড়াল থেকে কালো
মানুষের ধারা এসে বলে দেবে সরোষে আমাকে
কী ভাবে এগোবে তারা দুর্ভেদ্য নগরের তোরণে প্রথম।

কে জানে ফিরলো কেনো, তাকে দেখে কিষাণেরা অবাক সবাই
তাড়াতাড়ি নিড়ানির স্তূপাকার জঞ্জাল সরিয়ে
শস্যের শিল্পীরা এসে আলের ওপরে কড়া তামাক সাজালো।
একগাদা বিচালি বিছিয়ে দিতে দিতে
কে যেনো ডাকলো তাকে; সস্নেহে বললো, বসে যাও,
লজ্জার কি আছে বাপু, তুমি তো গাঁয়েরই ছেলে বটে,
আমাদেরই লোক তুমি। তোমার বাপের
মারফতির টান শুনে বাতাস বেহুঁশ হয়ে যেতো।
পুরনো সে কথা উঠলে এখনও দহলিজে
সমস্ত গাঁয়ের লোক নরম নীরব হয়ে শোনে।

সোনালি খড়ের স্তূপে বসতে গিয়ে—প্রত্যাগত পুরুষ সে-জন
কী মুস্কিল দেখলো যে, নগরের নিভাঁজ পোশাক
খামচে ধরছে হাঁটু। উরতের পেশী থেকে সোজা
অতদূর কোমর অবধি
সম্পূর্ণ যুবক যেনো বন্দী হয়ে আছে এক নির্মম সেলাইয়ে।
যা কিনা এখন তাকে স্বজনের সাহচর্যে, আর
দেশের মাটির বুকে অনায়াসে
বসতেই দেবে না।

তোমাকে বসতে হবে এখানেই,
এই ঠান্ডা ধানের বাতাসে।
আদরে এগিয়ে দেওয়া হুঁকোটাতে সুখটান মেরে
তাদের জানাতে হবে কুহুলি পাখির পিছু পিছু
কতদূর গিয়েছিলে পার হয়ে পানের বরোজ!
এখন কোথায় পাখি? একাকী তুমিই সারাদিন

বিহংগ বিহংগ বলে অবিকল পাখির মতন
চঞ্চুর সবুজ লতা রাজপথে হারিয়ে এসেছো।
অথচ পাওনি কিছু, না ছায়া না পল্লবের ঘ্রাণ
কেবল দেখেছো শুধু কোকিলের ছদ্মবেশে সেজে
পাতার প্রতীক আঁকা কাইয়ুমের প্রচ্ছদের নীচে
নোংরা পালক ফেলে পৌর-ভাগারে ওড়ে নগর শকুন।

এক নদী

তোমার মুখ ভাবলে, এক নদী
বুকে আমার জলের ধারা তোলে;
সামনে দেখি ভরা ভাতের থালা
ঝালের বাটি উপচে পড়ে ঝোলে।

পিঠার মতো হলুদ মাখা চাঁদ
যেনো নরম কলাপাতায় মোড়া;
পোড়া মাটির টুকরো পাত্রকে
স্মৃতি কি ফের লাগাতে পারে জোড়া!

নীল বইচা মাছের মতো চোখ
স্বপ্নে আমায় কুশল পুছে রোজ—
'ভালো কি আছো?' হায়রে ভালো থাকা!
নগরবাসী কে রাখে কার খোঁজ!

ফিরতে চাই, পাবো কি সেই পথ?
তরমুজের ক্ষেতের পাশে ঘর,
লজ্জাহীনা ফাজিল ছুঁড়ি এক
ভীষণ কালো, হাসতো থর থর।

মহাকালের কালোর চেয়ে কালো
রাত-বরণী রূপসী সেই পরী,
কাঁপিয়ে কাঁখে ঠিল্লা ভরা পানি
দেহের ভাঁজে ভেজা নীলাম্বরী—

উঠতো হেঁটে জলের ধার বেয়ে;
কালো-বাউশী যেনো কলমী বনে

অঙ্গ নেড়ে অস্ত গোলা জলে
দেখেছিলাম একদা কুক্ষণে।

ফিরলে আজো পাবো কি সেই নদী
স্রোতের তোড়ে ভাঙা সে এক গ্রাম ?
হায়রে নদী খেয়েছে সব কিছু
জলের ঢেউ ঢেকেছে নাম-ধাম।

জাতিস্মর

আমি যতবার আসি, মনে হয় একই মাতৃগর্ভ থেকে পুনঃ
রক্তে আবর্তিত হয়ে ফিরে আসি পুরনো মাটিতে।
ওঁয়া ওঁয়া ওঁয়া শব্দে দুঃখময় আত্মার বিলাপ
জড়সড় করে দেয় কোন দীন দরিদ্র পিতাকে।
আর ক্লান্ত নির্ভার আরামে
মায়ের সজল চোখ মুদে আসে।
কখন, কীভাবে যেন বেড়ে উঠি
পূর্বজন্মের সেই নম্রস্রোতা নদীর কিনারে।

কে কোথায় জাতিস্মর ?
সমস্ত প্রাণীর মধ্যে আমি কি কেবলই
স্মরণে রেখেছি স্পষ্ট কোন গাঁয়ে জন্মেছি কখন ?
অথচ মানুষ
নিজের পাপের ভারে
শুনেছি জন্মায় নাকি পশুর উদরে—
বলে ত্রিপিটক।

কী প্রপঞ্চে ফিরে আসি, কী পাতকে
বারম্বার আমি
ভাষায়, মায়ের পেটে
পরিচিত, পরাজিত দেশে ?
বাক্যের বিকার থেকে তুলে নিয়ে ভাষার সৌরভ
যদি দোষী হয়ে থাকি, সেই অপরাধে
আমার উৎপন্ন হউক পুনর্বার তীর্যক যোনিতে।
অন্তত তাহলে আমি জাতকের হরিণের মত
ধর্মগণ্ডিকায় গ্রীবা রেখে
নির্ভাবন দেখে যাবো
রক্তের ফিনকিতে লাল হয়ে
ধুয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ নির্ভয়ে, নির্বাণে।

নোলক

আমার মায়ের সোনার নোলক হারিয়ে গেলো শেষে
হেথায় খ‍ুঁজি হোথায় খ‍ুঁজি সারা বাংলাদেশে।
নদীর কাছে গিয়েছিলাম, আছে তোমার কাছে ?
হাত দিও না আমার শরীর ভরা বোয়াল মাছে।
বললো কেঁদে তিতাস নদী হরিণবেড়ের বাঁকে
শাদা পালক বকরা যেথায় পাখ্ ছড়িয়ে থাকে।

জল ছাড়িয়ে দল হারিয়ে গেলাম বনের দিক
সব‍ুজ বনের হরিৎ টিয়ে করে রে ঝিকমিক
বনের কাছে এই মিনতি, ফিরিয়ে দেবে ভাই,
আমার মায়ের গয়না নিয়ে ঘরে ফিরতে চাই।

কোথায় পাবো তোমার মায়ের হারিয়ে যাওয়া ধন
আমরা তো সব পাখপাখালি বনের সাধারণ।
সব‍ুজ চুলে ফুল পিন্দেছি নোলক পরি না তো !
ফুলের গন্ধ চাও যদি নাও, হাত পাতো হাত পাতো—
বলে পাহাড় দেখায় তাহার আহার ভরা ব‍ুক
হাজার হরিণ পাতার ফাঁকে বাঁকিয়ে রাখে ম‍ুখ।

এলিয়ে খোঁপা রাত্রি এলেন ফের বাড়ালাম পা
আমার মায়ের গয়না ছাড়া ঘরকে যাবো না।

আমার প্রাতরাশে

সকালে দরজা খুলে এই রাজভিখারীর হাত
যেমন সংবাদপত্রের মত অস্থায়ী কচুর পাতায়
খেতে চায় স্ফটিক শুভ্র স্বচ্ছ স্বাদ, আজ সেই পাত্রে টলমল
ঘোলাজল সমুদ্রের। দ্যাখো
এত বড়ো বঙ্গোপসাগরকেই আজ যেন
ভাঁজ করে পাঠালেন সাংবাদিক
সজ্জন সুধীরা।
আমার প্রাতরাশের হলদেটে
টাটকিনি মাছের ফাঁকে ফাঁকে
কলার টুমের মত অসাবধানে শুয়ে পড়লো
ভোলার অসংখ্য মৃত কিশোরের শব। আর
সঙ্গিনীর দীপ্ত ধূম্রময় চায়ের সুনামে
সন্দ্বীপের পেটফোলা যুবতীর লাশ ধোয়া পানি
ছিটকে ছিটকে ঝরতে লাগলো একটানা।

জানালায় হাওয়ার ঠকঠকি শুনে এত ভয় ?

বুঝিবা এখুনি
লখো লাখো মড়া গাই
বিশাল গোয়াল ভেবে
ঢুকে যাবে আমার কামরায়।
কিম্বা দেবতা বেল-এনলিল তার
আজ্ঞাবহ জলের পীড়নে
প্রাণহীন একপাল তাগড়া গরুকে
ঢেউয়ে ঢেউয়ে তাড়িয়ে ফিরিয়ে
আমার বুকের মধ্যে ঠুকলেন
খড়কে-অলা বিশাল পাজন।

সোনালি কাবিন

সোনার দিনার নেই, দেনমোহর চেয়ো না হরিণী
যদি নাও, দিতে পারি কাবিনবিহীন হাত দু'টি,
আত্মবিক্রয়ের স্বর্ণ কোনকালে সঞ্চয় করিনি
আহত বিক্ষত করে চারদিকে চতুর ভ্রূকুটি;
ভালোবাসা দাও যদি আমি দেব আমার চুম্বন,
ছলনা জানি না বলে আর কোন ব্যবসা শিখিনি;
দেহ দিলে দেহ পাবে, দেহের অধিক মূলধন
আমার তো নেই সখি, যেই পণ্যে অলঙ্কার কিনি।
বিবসন হও যদি দেখতে পাবে আমাকে সরল
পৌরুষ আবৃত করে জলপাইয়ের পাতাও থাকবে না;
তুমি যদি খাও তবে আমাকেও দিও সেই ফল
জ্ঞানে ও অজ্ঞানে দোঁহে পরস্পর হবো চিরচেনা
পরাজিত নই নারী, পরাজিত হয় না কবিরা;
দারুণ আহত বটে আর্ত আজ শিরা-উপশিরা।

২

হাত বেয়ে উঠে এসো হে পানোখী, পাটিতে আমার
এবার গুটাও ফণা কালো লেখা লিখো না হৃদয়ে;
প্রবল ছোবলে তুমি যতটুকু ঢালো অন্ধকার
তারও চেয়ে নীল আমি অহরহ দংশনের ভয়ে।
এ-কোন কলার ছলে ধরে আছো নীলম্বর শাড়ি
দরবিগলিত হয়ে ছুলকে যায় রাত্রির বরণ,
মনে হয় ডাক দিলে সে-তিমিরে ঝাঁপ দিতে পারি
আঁচল বিছিয়ে যদি তুলে নাও আমার মরণ।
বুকের ওপরে মৃদু কম্পমান নখবিলেখনে
লিখতে কি দেবে নাম অনুজ্জ্বল উপাধিবিহীন?
শরমিন্দা হলে তুমি, ক্ষান্তিহীন সজল চুম্বনে
মুছে দেবো আদ্যাক্ষর, রক্তবর্ণ অনার্য প্রাচীন।

বাঙালি কৌমের কেলি কল্লোলিত কর কলাবতী
জানতো না যা বাৎসায়ণ, আর যত আর্যের যুবতী।

৩

ঘুরিয়ে গলার বাঁক ওঠো বুনো হংসিনী আমার
পালক উদাম করে দাও উষ্ণ অঙ্গের আরাম,
নিসর্গ নমিত করে যায় দিন, পুলকের দ্বার
মুক্ত করে দেবে এই শব্দবিদ কোবিদের নাম।
কক্কার শব্দের শর আরণ্যক আত্মার আদেশ
আঠারোটি ডাক দেয় কান পেতে শোনো অষ্টাদশী
আঙুলে লুলিত করো বন্ধবেণী, সাপিনী বিশেষ
সুনীল চাদরে এসো দুই তৃষ্ণা নগ্ন হয়ে বসি।
ক্ষুধার্ত নদীর মতো তীব্র দু'টি জলের আওয়াজ
তুলে মিশে যাই চলো অকর্ষিত উপত্যকায়,
চরের মাটির মতো খুলে দাও শরীরের ভাঁজ
উগোল মাছের মাংস তৃপ্ত হোক তোমার কাদায়,
ঠোঁটের এ-লাক্ষারসে সিক্ত করে নর্ম কারুকাজ
দ্রুত ডুবে যাই এসো ঘূর্ণমান রক্তের ধাঁধায়।

৪

এ-তীর্থে আসবে যদি ধীরে অতি পা ফেলো সুন্দরী,
মুকুন্দরামের রক্ত মিশে আছে এ-মাটির গায়,
ছিন্ন তালপত্র ধরে এসো সেই গ্রন্থ পাঠ করি
কত অশ্রু লেগে আছে এই জীর্ণ তালের পাতায।
কবির কামনা হয়ে আসবে কি, হে বন্য বালিকা
অভাবের অজগর জেনো তবে আমার টোটেম,
সতেজ খুনের মতো এঁকে দেবো হিঙুলের টিকা
তোমার কপালে লাল, আর দীন-দরিদ্রের প্রেম।
সে-কোন গোত্রের মন্ত্রে বলো বধূ তোমাকে বরণ
করে এই ঘরে তুলি ?   আমার তো কপিলে বিশ্বাস,
প্রেম কবে নিয়েছিলো ধর্ম কিংবা সংঘের শরণ ?

মরণের পরে শুধু ফিরে আসে কবরের ঘাস।
যতোক্ষণ ধরো এই তাম্রবর্ণ অঙ্গের গড়ন
তারপর কিছু নেই, তারপর হাসে ইতিহাস।

৫
আমার ঘরের পাশে ফেটেছে কি কার্পাশের ফল ?
গলায় গুঞ্জার মালা পরো বালা, প্রাণের শবরী,
কোথায় রেখেছো বলো মহুয়ার মাটির বোতল
নিয়ে এসো চন্দ্রালোকে তৃপ্ত হয়ে আচমন করি।
ব্যাধের আদিম সাজে কে বলে যে তোমাকে চিনবো না
নিষাদ কি কোনদিন পক্ষিণীর গোত্র ভুল করে ?
প্রকৃতির ছদ্মবেশ যে-মন্ত্রেই খুলে দেন খনা
একই যাদু আছে জেনো কবিদের আত্মার ভিতরে।
নিসর্গের গ্রন্থ থেকে আশৈশব শিখেছি এ-পড়া
প্রেমকেও ভেদ করে সর্বভেদী সবুজের মূল,
চিরস্থায়ী লোকালয় কোনো যুগে হয়নি তো গড়া
পারেনি ঈজিপ্ট, গ্রীস, সেরাসিন শিল্পীর আঙুল।
কালের রেঁদার টানে সর্বশিল্প করে থর থর
কষ্টকর তার চেয়ে নয় মেয়ে কবির অধর।

৬
মাৎস্যন্যায়ে সায় নেই, আমি কৌম সমাজের লোক
সরল সাম্যের ধ্বনি তুলি নারী তোমার নগরে,
কোনো সামন্তের নামে কোনোদিন রচিনি শোলোক
শোষকের খাড়া ঝোলে এই নগ্ন মস্তকের 'পরে।
পূর্বপুরুষেরা কবে ছিলো কোন সম্রাটের দাস
বিবেক বিক্রয় করে বানাতেন বাক্যের খোয়াড়,
সেই অপবাদে আজও ফুঁসে ওঠে বঙ্গের বাতাস।
মুখ ঢাকে আলাওল—রোসাঙ্গের অশ্বের সোয়ার।
এর চেয়ে ভালো নয় হয়ে যাওয়া দরিদ্র বাউল ?
আরশি নগরে খোঁজা বাস করে পড়শী যে জন

আমার মাথায় আজ চূড়ো করে বেঁধে দাও চুল
তুমি হও একতারা, আমি এক তরুণ লালন,
অবাঞ্ছিত ভক্তিরসে এ যাবৎ করেছি যে ভুল
সব শুদ্ধ করে নিয়ে তুলি নব্য কথার কূজন।

৭

হারিয়ে কানের সোনা এ-বিপাকে কাঁদো কি কাতরা
বাইরে দারুণ ঝড়ে নুয়ে পড়ে আনাজের ডাল,
তস্করের হাত থেকে জেয়র কি পাওয়া যায় ত্বরা—
সে কানেট পরে আছে হয়তো বা চোরের ছিনাল !
পোকায় ধরেছে আজ এ দেশের ললিত বিবেকে
মগজ বিকিয়ে দিয়ে পরিতৃপ্ত পণ্ডিত সমাজ।
ভদ্রতার আবরণে কতদিন রাখা যায় ঢেকে
যখন আত্মায় কাঁদে কোনো দ্রোহী কবিতার কাজ ?
ভেঙো না হাতের চুড়ি, ভরে দেবো কানের ছেদুর
এখনো আমার ঘরে পাওয়া যাবে চন্দনের শলা,
ধ্রুপদের আলাপনে অকস্মাৎ ধরেছি খেউড়
ক্ষমা করো হে অবলা, ক্ষিপ্ত এই কোকিলের গলা।
তোমার দুধের বাটি খেয়ে যাবে সোনার মেকুর
না দেখার ভান করে কত কাল দেখবে, চঞ্চলা ?

অঘোর ঘুমের মধ্যে ছুঁয়ে গেছে মনসার কাল
লোহার বাসরে সতী কোন ফাঁকে ঢুকেছে নাগিনী,
আর কোনদিন বলো, দেখবো কি নতুন সকাল ?
উষ্ণতার অধীশ্বর যে গোলক ওঠে প্রতিদিনই।
বিষের আতপে নীল প্রাণাধার করে থরো থরো
আমারে উঠিয়ে নাও হে বেহুলা, শরীরে তোমার,
প্রবল বাহুতে বেঁধে এ-গতর ধরো, সতী ধরো,
তোমার ভাসানে শোবে দেবদ্রোহী ভাটির কুমার।
কুটিল কালের বিষে প্রাণ যদি শেষ হয়ে আসে,

কুন্তল এলিয়ে কন্যা শুরু করো রোদন পরম।
মৃত্যুর পিঞ্জর ভেঙে প্রাণপাখি ফিরুক তরাসে
জীবনের স্পর্ধা দেখে নত হোক প্রাণাহারী যম,
বসন বিদার করে নেচে ওঠো মরণের পাশে
নিটোল তোমার মুদ্রা পাল্টে দিক বাঁচার নিয়ম।

৯

যে বংশের ধারা বেয়ে শ্যাম শোভা ধরেছো, মানিনী
একদা তারাই জেনো গড়েছিলো পুন্ড্রের নগর
মাটির আহার হয়ে গেছে সব, অথচ জানিনি
কাজল জাতির রক্ত পান করে বটের শিকড়।
আমারও নিবাস জেনো লোহিতাভ মৃত্তিকার দেশে
পূর্বপুরুষেরা ছিলো পাট্টিকেরা পুরীর গৌরব,
রাক্ষসী গুল্মের ঢেউ সবকিছু গ্রাস করে এসে
ঝিঁঝির চিৎকারে বাজে অমিতাভ গৌতমের স্তব।
অতীতে যাদের ভয়ে বিভেদের বৈদিক আগুন
করতোয়া পার হয়ে এক কণ্ড এগোতো না আর,
তাদের ঘরের ভিতে ধরেছে কি কৌটিল্যের ঘুণ ?
ললিত সাম্যের ধ্বনি ব্যর্থ হয়ে যায় বার বার;
বর্গীরা লুটছে ধান নিম খুনে ভরে জনপদ
তোমার চেয়েও বড়ো হে শ্যামাঙ্গী, শস্যের বিপদ।

১০

শ্রমিক সাম্যের মন্ত্রে কিরাতেরা উঠিয়েছে হাত
হিয়েনসাঙের দেশে শান্তি নামে দেখো প্রিয়তমা,
এশিয়ায় যারা আনে কর্মজীবী সাম্যের দাওয়াত
তাঁদের পোশাকে এসো এঁটে দিই বীরের তকোমা।
আমাদের ধর্ম হোক ফসলের সুষম বন্টন,
পরম স্বস্তির মন্ত্রে গেয়ে ওঠো শ্রেণীর উচ্ছেদ,
এমন প্রেমের বাক্য সাহসিনী করো উচ্চারণ
যেন না ঢুকতে পারে লোকধর্মে আর ভেদাভেদ।

তারপর তুলতে চাও কামের প্রসঙ্গ যদি নারী
খেতের আড়ালে এসে নগ্ন করো যৌবন অন্দর,
শস্যের সপক্ষে থেকে যতটুকু অনুরাগ পারি
তারো বেশী ঢেলে দেবো আন্তরিক রতির দরদ,
সলাজ সাহস নিয়ে ধরে আছি পট্টময় শাড়ি
সুকণ্ঠি কবুল করো, এ অধমই তোমার মরদ।

১১

আবাল্য শুনেছি মেয়ে বাংলাদেশ জ্ঞানীর আতুড়
অধীর বৃষ্টির মাঝে জন্ম নেন শত মহীরুহ,
জ্ঞানের প্রকোষ্ঠে দেখো, ঝোলে আজ বিষণ্ণ বাদুড়
অতীতে বিশ্বাস রাখা হে সুশীলা, কেমন দুরূহ ?
কী করে মানবো বলো, শ্রীজ্ঞানের জন্মভূমি এই
শীলভদ্রও নিয়েছিলো নিঃশ্বাসের প্রথম বাতাস,
অতীতকে বাদ দিলে আজ তার কোনো কিছু নেই
বিদ্যালয়ে কেশে ওঠে গুটিকয় সিনানথ্রোপাস।
প্রস্তর যুগের এই সর্বশেষ উল্লাসের মাঝে
কোথায় পালাবে বলো, কোন ঝোপে লুকোবে বিহ্বলা ?
স্বাধীন মৃগের বর্ণ তোমারও যে শরীরে বিরাজে
যখন আড়াল থেকে ছুটে আসে পাথরের ফলা,
আমাদের কলাকেন্দ্রে, আমাদের সর্ব কারুকাজে
অস্তিবাদী জিরাফেরা বাড়িয়েছে ব্যক্তিগত গলা।

১২

নদীর সিকস্তী কোনো গ্রামাঞ্চলে মধ্যরাতে কেউ
যেমন শুনতে পেলে অকস্মাৎ জলের জোয়ার,
হাতড়ে তালাশ করে সঙ্গিনীকে, আছে কিনা সেও
যে নারী উন্মুক্ত করে তার ধন-ধান্যের দুয়ার।
অন্ধ আতঙ্কের রাতে ধরো ভদ্রে, আমার এ-হাত
তোমার শরীরে যদি থেকে থাকে শস্যের সুবাস,

খোরাকির শত্রু আনে যত হিংস্র লোভের আঘাত
আমরা ফিরাবো সেই খাদ্যলোভী রাহুর তরাস।
নদীর চরের প্রতি জলে-খাওয়া ডাঙার কিষাণ
যেমন প্রতিষ্ঠা করে বাজখাই অধিকার তার,
তোমার মস্তকে তেমনি তুলে আছি ন্যায়ের নিশান
দয়া ও দাবীতে দৃঢ় দীপ্তবর্ণ পতাকা আমার;
ফাটানো বিদ্যুতে আজ দেখো চেয়ে কাঁপছে ঈশান
ঝড়ের কসম খেয়ে বলো নারী, বলো তুমি কার?

১৩

লোবানের গন্ধে লাল চোখ দুটি খোলো রূপবতী
আমার নিঃশ্বাসে কাঁপে নক্‌শাকাটা বস্ত্রের দুকূল,
শরমে আনত কবে হয়েছিল বনের কপোতী?
যেন বা কাঁপছো আজ ঝড়ে পাওয়া বেতসের মূল?
বাতাসে ভেঙেছে খোঁপা, মুখ তোলো, হে দেখনহাসি
তোমার টিক্‌লি হয়ে হৃদপিণ্ড নড়ে দুরু দুরু
মঙ্গলকুলোয় ধান্য ধরে আছে সারা গ্রামবাসী
উঠোনে বিন্নীর খই, বিছানায় আতর, অগুরু।
শুভ এই ধানদুর্বা শিরোধার্য করে মহিয়সী
আবরু আলগা করে বাঁধো কের চুলের স্তবক,
চৌকাঠ ধরেছে এসে ননদীরা তোমার বয়সী
সমানত হয়ে শোনো সংসারের প্রথম সবক।
বধূবরণের নামে দাঁড়িয়েছে মহামাতৃকুল
গাঙের ঢেউয়ের মতো বলো কন্যা কবুল, কবুল।

১৪

বৃষ্টির দোহাই বিবি, তিলবর্ণ ধানের দোহাই
দোহাই মাছ-মাংস দুগ্ধবতী হালাল পশুর,
লাঙল জোয়াল কাস্তে বায়ুভরা পালের দোহাই
হৃদয়ের ধর্ম নিয়ে কোন কবি করে না কসুর।

কথার খেলাপ করে আমি যদি জবান নাপাক
কোন দিন করি তবে হয়ো তুমি বিদ্যুতের ফলা,
এ-বক্ষ বিদীর্ণ করে নামে যেন তোমার তালাক
নাদানের রোজগারে না উঠিও আমিষের নলা।
রাতের নদীতে ভাসা পানিউড়ী পাখির ছতরে,
শিষ্ট ঢেউয়ের পাল যে কিসিমে ভাঙে ছল ছল
আমার চুম্বন রাশি ক্রমাগত তোমার গতরে
ঢেলে দেবো চিরদিন মুক্ত করে লজ্জার আগল,
এর ব্যতিক্রমে বানু এ-মস্তকে নামুক লানৎ
ভাষার শপথ আর প্রেমময় কাব্যের শপথ।

আত্মীয়ের মুখ

(আহমেদুর রহমান স্মরণে)

কেউ কেউ আছেন মনে, যেন কোনো আত্মীয়ের মুখ
বুকের ভেতর থেকে হেসে ওঠে, মৃদু শব্দে জিজ্ঞাসে কুশল
আর আমি আমার চেয়ার ছেড়ে নৈশব্দের মধ্যে হেঁটে গিয়ে
নতুন সিগ্রেটকেস খুলে ধরে বলি,
যেখানে গেলেন সেখানে রয়েছে নাকি অবসান ?—
আমাদের এই দীন সামান্য জগতে
মনুষ্যভাষার কোষে, কয়েকটি অলীক শব্দে
আছে যার দয়ার্দ্র কলাপ !

বইয়ের দোকান যদি নেই, কেনো তবে সেখানে গমন ?

সকালে সংবাদপত্র, রাজনীতি, ক্ষুব্ধ খোঁচাখুঁচি
যা কিনা রক্তাক্ত শার্টের মতো পরে আছে আমাদের ভয়ার্ত শতক-
এসবের ঊর্ধ্বে আজ বিনাবাক্য ব্যয়ে
কী করে থাকেন ?

জানি না দেশের খবর কিছু পান কিনা,
কি ঘটবে এশিয়ায়—এ নিয়ে তর্ক করে আপনার যাওয়ার পর
পৃথিবীর সবকটি শাদা কবুতর
ইহুদী মেয়েরা রেঁধে পাঠিয়েছে মার্কিন জাহাজে।

তরঙ্গিত প্রলোভন

পীরের মাজারে বসে কোনো রাতে বাউলের দল
যেমন হঠাৎ ধরে হু হু শব্দে প্রেমের জিকির
আমার কবিতা সেই মত্তদের রাতের গজল
তোমার শ্রবণে দিক কলজে ছেঁড়া কথার তিমির।

আস্তিক সম্মান যদি পায় কোনো শূন্যের পূজারী
সাকার রূপের ভক্ত কেন তবে ঘৃণার্হ বলো না ?
আমার সম্মুখে তুমি বিদ্যাধরী দ্রাবিড় কুমারী
মুক্ত করে দাও গাঢ় মহাকৃষ্ণ কান্তির ছলনা।

নদীর গভীর থেকে কতদিন বাতি জেলে ধরে
গঞ্জের দালাল ভেবে ডেকেছিল ভরার কুটিলা
তরঙ্গিত প্রলোভন ক্রমাগত বুকে এসে পড়ে
টান করে ধরে আছি এক দীপ্ত ধনুকের ছিলা।

কে বিদ্রোহী আলো জ্বালো এতদূর দীর্ণ জনপদে
আমাকে দেখাও মুখ অন্ধকার রাত্রির বিপদে।

তোমার আড়ালে

কোথাও রয়েছে ক্ষমা, ক্ষমার অধিক সেই মুখ
জমা হয়ে আছে ঠিক অন্তরাল আত্মার ওপর
আমার নখের রক্ত ধুয়ে গেলে
যেসব নদীর জল লাল
হয়ে যাবে বলে আমি ভয়ে দিশেহারা
আজ সে পানির ধারা পাক খেয়ে নামে
আমার চোখের কোণে
আমার বুকের পাশ ঘেঁষে।

তোমার আড়ালে দেখি ঢেকে যায় আমার নিবাস
শরীর, স্বাস্থ্যের দীপ্তি, পৌরুষের চিহ্ন কতিপয়
ঢেকে যায় গাছপালা পতঙ্গ উদ্ভিদ
এমন কি নারীর মুখ, কান্তিময়
মাংসের কপাট।

ঢেকে যায় কাব্যহিংসা, পক্ষপাত
শিল্পের আসন।
তোমার আড়ালে পড়ে থাকে
মৃত্যুভয়,
কালজ্ঞ কবির বৈভব।

ভাগ্যরেখা

সামনে দেখি গর্ত এক রয়েছে বড়ো হা করে
আমার দিকে, দেখি, নিগূঢ় আঘাতে;
জীবন যেন জালের মাছি টান্‌ছে কালো মাকড়ে
কোনো কিছুই পারে না তারে জাগাতে।

তাহলে আমি জেনেছি এই, আমার প্রাণ ঝলকের
যা কিছু ছোঁয় দেখেছি সবি ঝালিয়ে;
বয়স করে তাড়া ভীষণ জীবন নাকি পলকের
শহর থেকে শহরে আসি পালিয়ে।

প্রেমের কাছে থেমেছিলাম, গরীব সেই অসতী—
আপন মনে দিচ্ছে টান বিড়িতে,
সেওতো এক বিরাণ নারী, গুঁড়িয়ে যাওয়া বসতি
ছিলাম যার দর্‌গাহের সিঁড়িতে।

লোভের লতা বাড়েনি মনে, ভূমিতে সেই চাষও না
যা দিয়ে যায় ভাগ্যরেখা নাড়ানো;
যেখান থেকে এসেছিলাম অতীত সেই বাসনা
পাবো কি তারে শেমিজ খুলে দাঁড়ানো?

শোণিতে সৌরভ

তোমার মুখ আঁকা একটি দস্তায়
লুটিয়ে দিতে পারি পিতার তরবারি
বাগান জোত জমি সহজে, সস্তায়
তোমার মুখ আঁকা একটি দস্তায়;
পরীর টাকা পেলে কেউ কি পস্তায়?
কে নেবে তুলে নাও যা কিছু দরকারী,
তোমার মুখ আঁকা একটি দস্তায়
বিলিয়ে দিতে পারি পিতার তরবারি।

তোমার মাংসের উষ্ণ আতাফল
শোণিতে মেশালো কি মধুর সৌরভ?
প্রতিটি দিন যায় আহত, নিষ্ফল
তোমার মাংসের উষ্ণ আতাফল,—
ঈভের মতো আজ হওনা চঞ্চল
আমার ডানহাতে রাখো সে গৌরব;
তোমার মাংসের উষ্ণ আতাফল
শোণিতে মেশালো কি মধুর সৌরভ।

তোমার নাভি দেখে হাঁটছি একা আমি
দেবে কি গন্ধের কৃষ্ণ সানুদেশ?
যেখানে পাখি নেই রক্ত দ্রুতগামী
তোমার নাভি দেখে হাঁটছি একা আমি
মধ্যযুগী এক যুবক গোস্বামী
দেহেই পেতে চায় পথের নির্দেশ;
তোমার নাভিমূলে দেখেছি একা আমি
নরম গন্ধের কৃষ্ণ সানুদেশ।

গোপন রাত্রির কোপন যাদুকর
আমার করতলে রেখেছে অগ্নি,
পুড়িয়ে এসেছি তো যা ছিল নির্ভগ্ন
গোপন রাত্রির কোপন যাদুকর—
দেখালো সেই মুখ দারুণ সুন্দর
জেনেছি কে আমার কৃপণ ভগ্নি;
গোপন রাত্রির কোপন যাদুকর
আমার করতলে জেবলেছে অগ্নি।

কনক জঙ্ঘার বিপুল মাঝখানে
রচেছো গরিয়সী এ কোন দর্প ?
আকুল বাঁশরীর অবশ টানে টানে
কনক জঙ্ঘার বিপুল মাঝখানে,
আবাস ছেড়ে আমি আদিম উত্থানে
ধরেছি ফণা নীল আহত সর্প,
কনক জঙ্ঘার বিপুল মাঝখানে
মেলেছো গরিয়সী এ কোন দর্প।

সাহসের সমাচার

(কাজী নজরুল ইসলামকে)

সাহসের সমাচার শেষ হয়ে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে
হে কবি, একদা
ভেসে যেতে যেতে কালো তোমার চুলের মত মেঘ
বড়ো অনুরোধ করে রক্তের ওপারে যেতে প্ররোচনা দিতো,
কারাগার ভেদ করে দাঁড়াতো দণ্ডিত।
পথে এসো, বলে
প্রকাণ্ড প্রাচীন মুখে গাওয়া হতো ধ্বংসের ধ্রুপদ।

বিপ্লব, বিপ্লব বলে হে মিথ্যার মোহন কোকিল
বাংলার শীতল রক্তে তুলে দিয়ে খারাপ ঝংকার
নিসর্গের স্তনে যেনো কালো এক তিল হয়ে গেলে !

আজ তাই শান্তি নাও কবিবর। নাও এ-হলুদ
শুকনো মাংসের স্তূপ। ঢাকো প্রেম মলিন চাদরে
যেন না গড়ায় রস সংক্রামক পারার নিঃসার।
অথবা বধির হও, যেনো কোনো সঙ্গীতের স্বেদ
না জমে ললাটে আর একবিন্দু। এখন সটান
শুয়ে পড়ো নিয়তির তীরবিদ্ধ মত্ত বাজপাখি।

চোখ

এখন চোখ নিয়েই হলো আমার সমস্যা। যেন
আমি জন্ম থেকেই অতিরিক্ত অবলোকন শক্তিকে
ধারণ করে আছি।

প্রতিটি বস্তুর বর্ণচ্ছটা বিকীর্ণ হচ্ছে আমার দৃষ্টিতে।
মানুষ যখন কোনো বর্ণের বিবরণ দান করে
আমি বুঝতে চেষ্টা করি।
আমি বুঝতে পারি না তোমরা কী করে
কোনো রঙিন জিনিসের নাম নির্ধারণ কিম্বা
শস্যক্ষেত্র দেখে আপ্লুত হয়ে বলে ওঠো—
সবুজ, সবুজ !
আমি যখন সবুজের দিকে তাকাই
সে আর সবুজ থাকে না। আমি
গলিত মথিত সবুজের সাথে
নিজেকেও সবুজাভ দেখি।

আমার স্ত্রী সবুজ হয়ে যান, ছেলেদের
সবুজ বলে মনে হয়।
যে মেয়েটি নীল ফ্রক পরে বারান্দায় খেলে
সেও যেন সবুজ প্রজাপতি।

তারপর শুরু হয় সবুজের পীড়ন।
সবুজ আমার চোখে আঘাতের মত বাজতে থাকে
আমার চোখে তখন সবুজকে লাল বলে মনে হয়।
সে লাল আবার নীল হয়ে যায়। তারপর কালো।
এইভাবে শতবর্ণে রঞ্জিত হতে হতে

শাদা এসে সব কিছুকে ঢেকে ফেলে। আমার
চোখ তৃপ্ত হতে থাকে। আমি তখন
স্ত্রীকে দেখি না, পুত্র-কন্যাকে দেখি না।

না, আমি দৃষ্টিবিভ্রমের কথাও বলছি না।
আমার চোখে কোন অসুখ নেই। ডাক্তার ওদুদ
আমার চশমার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন না।
সম্ভাব্য দূরত্ব থেকে আমি প্রতিটি অক্ষর
ঠিকমত পড়তে পারি।

আমি এক সময় সংবাদপত্রে প্রুফরিডার ছিলাম।
প্রতিটি আ-কার ই-কারের অনুপস্থিতি এখনও
আমার চোখে লাগে। তবু কেন এরকম হচ্ছে
কে আমাকে বলে দেবে ?
আমি কেন প্রতিটি রংয়ের ভিতর
অন্য রংকে দেখতে পাই।

উল্টানো চোখ

এইতো সেই অবসর, যখন কোনো দৃশ্যই আর গ্রাহ্য নয়।
পলকহীন চোখ যেন উল্টে যাচ্ছে। যেখানে থরে থরে সাজানো আছে
ঘটনার বিদ্যুচ্চমক। না, কাউকে ধমক দিতে চাই না।
কোনো কর্তব্য আমার জন্যে নয়। বরং হৃদয়ের ভেতর
যে ব্রহ্মাণ্ডকে বসিয়ে রেখেছি তার গোলক
দ্রুত আবর্তিত হোক।

ভিয়েতনামে বোমা পড়ছে। আমি তার প্রতিবাদ করি।

আমার উল্টানো চোখ যেখানে খুশি ভ্রমণে উদগ্রীব।

এমনকি মেয়েরা যখন কলকাতায় শাড়ি পাল্টায়,
আমার চোখ নির্লজ্জের মত দ্রুত দেখে নেয়।
সাত পাট কাপড় যেখানে কাঁচের মত স্বচ্ছ
কে আর আমাকে অন্ধ করতে পারবে?

আমার চোখ দ্রষ্টব্যের উল্টো দিকে ফেরানো
সেখানে ফালতু আবরণ উঠে গিয়ে আসল বেরিয়ে পড়ে।
কেউ বক্তৃতা করলে
আমি শুনতে পাই না।
বরং বক্তার জিভের ওপর
তার আত্মাকে দেখতে পাই। কেউ সেজদায় নত হলে
আমি দেখি একটি কলস ভরা লোভ উবুড় হয়েছে।

পরিচিত অপরিচিত মেয়েরা এখন আমার সামনে না-আঁসুক

কারণ তাদের ঢাকাঢাকি বড়ো বেশী। আর
আমার চোখে এখন আবরণের অস্তিত্ব নেই।

এখন আমার মনের মধ্যে রয়েছে এক শিল্পীর একক প্রদর্শনী।
সবাই তার বর্ণলেপনের পারদর্শিতা নিয়ে গল্প-গুজব করুন,
কিন্তু আমি সমস্ত বিমূর্ততাকে ভেদ করে দেখলাম
এক বেকার নিরপরাধ কামুক বেশ্যার বুকে মাথা রেখে কাঁদছে।
যে মেয়েটি বুকে হাত রাখলে খদ্দেরদের ভীষণ ধমকাতো।

আমার ঘরে একজন জাতীয় নেতার ছবি রয়েছে
আমি সেদিকে তাকাতে ভয় পাই।
একবার সেদিকে চোখ পড়লেই ছবিটা
পঁচিশে মার্চের রাত্রি হয়ে যায়।
পারতপক্ষে আমি নিজের ছবির দিকেও তাকাই না।--
বিশ্রী রেখাবহুল পোর্ট্রেট। একবার চোখ পড়লেই ছবিটা
কাঁপতে কাঁপতে এক বড়সড়ো গ্রাম হয়ে যায়।
এঁদো ডোবা। কচুরিপানার ওপর বেগনি ফুল। নেবুপাতার
ভেতর দিয়ে ধাবমান বাতাস। গোবরের গন্ধ। কোকিল। পাট খেতে
দমবন্ধ গরমের মধ্যে মুল্লাবাড়ীর সবচেয়ে রূপসী মেয়েটিকে
চুমু খাওয়া।
এই তো আমার মুখ ভাইসব, এইতো আমার মুখ !

আমার মুখচ্ছবির মধ্যে এইতো চারজন যুবক প্রবেশ করলো।
কচুরিপানার শিকড়ের মত কালো উজ্জ্বল দাড়ি। দুমড়ানো
পোশাক। যারা সর্বশেষ আহ্বানে হৃদয়ের ভেতর
অস্ত্র জমা রেখেছে। এখন আমার মুখের ভেতর তাদের
গুপ্ত অধিবেশন। যে অতর্কিতে
শহরগুলোকে দখল করা হবে
আমার মুখ তারি রক্তাক্ত পরিকল্পনা।

আভূমি আনত হয়ে

এ ঘুরে দাঁড়ানো নয়, শুধু আভূমি আনত হয়ে থাকা
দৃশ্যের আঘাত থেকে মুদে রাখা চোখের প্রতিভা।
চোখ বড়ো সাংঘাতিক রক্তের প্রান্তর ছুঁয়ে থাকে—
নিসর্গ নিবদ্ধ করে দেখে নেয় নারী আর নদীর নিতল।
ধরে রাখে মাছ পাখি পশু আর পতঙ্গের প্রসঙ্গ সকল
সমস্ত সম্বন্ধসূত্র ভেদ করে আনে তীব্র চাক্ষুষ প্রমাণ।

আমার মস্তিষ্কে নয়
আমার কৈশোর বুঝি বসে আছে চোখের ভিতরে
বিশাল ধনুক হাতে ক্লান্ত এক সবুজ বালক।

অথচ এ-দৃষ্টিগ্রাহ্য আওতায় আমার
আমারি ছেলেকে দেখি টেরি কাটে ঘুরিয়ে দর্পণ।
কে জানে আমিই কিনা, কিম্বা ঠিক আমিই রয়েছি
ফিরিয়ে দিচ্ছি চুল সোজাসুজি তালুর ওপর।
সটানে পরেছি মোজা, ঘষে নিয়ে হাতার বোতাম
ব্রাশ চালিয়েছি জোরে—বুঝিবা স্তিমিত গ্লাসকীড়্
চল্লিশ বছর থেকে ঝেড়ে ফেলবে বাপের বয়স।

চোখ যখন অতীতাশ্রয়ী হয়

আমার চোখ যখন অতীতাশ্রয়ী হয়, তখনি আমার ভয়।
মনে হয়, চোখ যেন আস্তে আস্তে কানের দিকে সরে যাচ্ছে।
কিম্বা শ্রবণেন্দ্রীয় এসে আমার চোখের ভেতর
শব্দের রাজদন্ড ধরেছে।
যেদিকে তাকাই, শুধু শুনতে পাই। শুনতে পাই
দূরাগত ভাঙনের শব্দ। যেন বিশাল চাঙড়
ভেঙে পড়ছে কোথাও। আর ছিটকে পড়া জলের কণায়
আমি আর চোখ মেলতে পারি না।

আমি যখন ছোটো, আমাদের গ্রাম ছিল
এক উন্দাম নদীর আক্রোশের কাছে। ক্রমাগত ভাঙনের রেখা
ধীরগতিতে গ্রামকে উজাড় করে এগোতে থাকলে
আমি প্রাত্যাহিক ভাঙনের খবর আমার মাকে এনে দিতাম।
দৌড়ে এসে বলতাম, আজ ইদ্রিসদের
গোয়াল ঘরটা গেল মা।

আমার বাপের ছিল অঘুমের অসুখ। সারারাত
ধসনামার শব্দ পোহাতেন। কখনো দেখতাম
সড়কি নিয়ে নদীর দিকে যাচ্ছেন।
আমি তার পেছন নিলে বলতেন, আয়
কোথায় চর জাগলো দেখে আসি।
দশ মাইলের মধ্যে চরের খবর মাঝিরা কেউ জানতো না।
গলুইয়ের ওপর থেকে হাত নেড়ে নেড়ে
তারা দূর গঞ্জের দিকে চলে গেলে
আমরা ঘরে ফিরতাম।

ভাঙন যখন চল্লিশ গজের মধ্যে এগোলো। আমার বাপ
তখন অসুস্থ। কী তার অসুখ ছিল জানি না,

কেবল আমাকে নদীর কাছে যেতে বলতেন। বলতেন
জেনে আয় কোন দিকে চর পড়েছে।
আমি তার কথায় দৌড় দিতাম। কিন্তু ফিরে এসে বলতাম
আজ কৈবর্তপাড়ার নলিনীদের ভিটেবাড়ী ভাঙলো বাবা।
মা চোখ টিপতেন। কিন্তু আমিতো ছিলাম শিশু
যে মিথ্যা বলতে শেখেনি। একদিন এ-ভাবেই
সব শেষ হয়ে গেল।

যেদিন নদী এসে আমাদের বাড়ীটাকে ধরলো
সেদিনের কথা আমার চোখের ওপর স্থির হয়ে আছে।
বাক্সপেটরা থালা ঘটিবাটি নিয়ে আমরা
গাঁয়ের পেছনে বাপের কবরে গিয়ে দাঁড়ালাম।
জায়গাটা ছিল উঁচু আর নিরাপদ। দেখতে
অনেকটা চরের মতই। মা সেখানে বসে
হাঁপাতে লাগলেন। কাঁদিলেন এমনভাবে যে
অভিযোগহীন এমন রোদনধ্বনি বহুকাল শুনিনি আমি।

তারপর ভাঙনের রেখা পেছনে রেখে
আমরা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছিতড়ে পড়লাম।
কেউ গেলাম মামুর বাড়ীতে। কেউ ফুপুর। যেমন
বাবেল থেকে মানুষের ধারা
ছড়িয়ে পড়লো পৃথিবীতে।

আমার চোখের তলদেশে

একদা এমন ছিল যে, আমার চোখই ছিল সমস্ত দুঃখের আকর।
এমন কি একটা করুণ উপন্যাসও পড়তে পারতাম না আমি।
বুক ঠেলে কান্না উঠে আসত চোখে। গাল বেয়ে নামতো ধারাজল।
উপচানো চোখ নিয়ে আমি লজ্জায় মুখ লুকাতাম।
একটা সামান্য বই নিয়ে আমার এ অবস্থা দেখে
পড়ার টেবিলে বোনেরা পাথর হয়ে যেতো। আম্মা
থমকে দাঁড়াতেন। আর আব্বা ঘরে থাকলে
সোজাসুজি বিহ্বলদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে
কি যেন ভাবতে ভাবতে মসজিদে চলে যেতেন।

কিন্তু তাদের চোখ থাকতো সর্বদাই নির্জলা পাথর।

দুঃখ পেলে তারা একেবারেই কাঁদতেন না, এমন নয়।
সম্ভ্রান্ত অথবা সন্তানহারা হলে তারাও কাঁদতেন। তাদের
চোখও ফেটে যেতো। একবার আমার কনিষ্ঠতমা বোন
নিউমোনিয়ায় মারা গেলে আম্মা অনেকদিন
কেঁদেছিলেন। সে কান্না আমি ভুলিনি।

আমার মাকে শোকাভিভূতা ভাবলেই, দৃশ্যটি
চোখের ওপর এসে দাঁড়ায়। কিন্তু আবহমান কালের মধ্যে
তারা ছিলেন বাষ্পহীন। নির্জল, নির্মেঘ।

আমার কৈশোর আমাকে আর্দ্র করে রেখেছিল।
আর আমার চোখ ছিল গ্লাসে ভিজানো
ইছবগুলের দানার মত জলভরা।

এখন সবকিছুই পাল্টে গেছে।

যে চোখ ছিল ঝিলের ভিতর উত্থিত ফোয়ারার মত।
এখন তার তলদেশে চকচকে বালি।
আজকাল আমার মার সাথে আমার কদাপি দেখা হয়।
মাঝে মাঝে আসেন। গ্রাম থেকে নিয়ে আসেন সরু চাল।
গাওয়া ঘি। খাঁটি সর্ষের তেল আর বিশুদ্ধ অনুতাপময় কান্না।
তার ধারণা শহরের ভেজালে আমার স্বাস্থ্য নষ্ট হচ্ছে।
আমার ছেলেরা ঠিকমত বাড়ছে না।
যেমন আমি ভাবি, গ্রাম থেকে শুদ্ধ মানুষের স্রোত এসে
একদিন শহর দখল করে নেবে। তেমনি।

আমরা দুদিক থেকে দু'জনকে দেখি।
আমার মার শুধু অভিযোগ আর অভিযোগ
একবার ভাইয়ের বিরুদ্ধে। একবার বোন আর
বহমান কালের বিরুদ্ধে। তারপর
অবিরল কান্না।

আমার বাপ নেই। থাকলে
তিনিও কি কাঁদতেন ?

তবু আমার জননী বাষ্পাকুল চোখে কেন আমার
চোখের দিকেই তাকিয়ে থাকেন ?
আমি অবশ্য সান্ত্বনাচ্ছলে তাকে ধমক লাগাই।
তার কান্না থামে না।
তাকে সংসার চালাবার মত টাকা দিই। কিন্তু
আমার চোখ শুকনো থাকে। যেন
সকালের সংবাদপত্রের দু'টি জাজ্বল্যমান
আন্তর্জাতিক হেডলাইন।

ক্যামোফ্লাজ

নিজেকে বাঁচাতে হলে পরে নাও হরিৎ পোশাক
সবুজ শাড়িটি পরো ম্যাচ করে, প্রজাপতিরা যেমন
জন্ম-জন্মান্তর ধরে হয়ে থাকে পাতার মতন।
প্রাণের ওপরে আজ লতাগুল্ম পত্রগুচ্ছ ধরে
তোমাকে বাঁচতে হবে হতভম্ব সন্ততি তোমার।

নিসর্গের ঢাল ধরো বক্ষস্থলে
যেন হত্যাকারীরা এখন
ভাবে বৃক্ষরাজি বুঝি
বাতাসে দোলায় ফুল
অবিরাম পুষ্পের বাহার।

জেনো, শত্রুরাও পরে আছে সবুজ কামিজ
শিরস্ত্রাণে লতাপাতা, কামানের ওপরে পল্লব
ঢেকে রেখে
নখ
দাঁত
লিঙ্গ
হিংসা
বন্দুকের নল
হয়ে গেছে নিরাসক্ত বিষকাটালির ছোটো ঝোপ।

বাঁচাও বাঁচাও বলে
এশিয়ার মানচিত্রে কাতর
তোমার চিৎকার শুনে দোলে বৃক্ষ
নিসর্গ, নিয়ম।

আমার অনুপস্থিতি

আমার অনুপস্থিতি হাই তোলে মার্চের গুমোট বাতাসে
কে ভাবতো, খৃষ্টাব্দের শেষ রবিবারও যাবে নিঃসঙ্গ এমন।
অথচ ফিরি না আমি, তোমার খোঁপার ফুল ঝরে যায় পিঠে
চায়ের সরঞ্জাম তুমি তুলে নাও, ভাবো,
শাড়িটা পাল্টে নিয়ে শুয়ে থাকবে কিনা নীচে দক্ষিণের ঘরে।
আর আমি, প্রতিশ্রুতিভঙ্গকারীদের মতো পরেছি পোশাক
যেন সবি ভুলে গেছি, কোনোকালে কাউকে কখনো
বলিনি আসবো ফিরে-ঘরে থেকো, বারান্দায় বসবো দু'জন।

এখনো অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে
আমার পছন্দ মত শাড়ি কোনো নারী পরেছে কখনো।
আমি ভালোবাসি নদী, তাই হাসতে হাসতে সেও হয়ে যেতো নদী।
নিসর্গের নীতি তাকে বোঝাতে গেলেই,
আহা তুমি গাছ হও যদি—
আমার আদেশ শুনে অমনি সে
এই দ্যাখো, এই বলে মেলে দিতো তার ডালপালা।
আজ প্রতিশ্রুতিভঙ্গকারীদের মতো পরেছি পোশাক
আমার অনুপস্থিতি হাই তোলে মার্চের গুমোট বাতাসে।

কেবল আমার পদতলে

আমার জিজ্ঞাসা যেন ক্রমান্বয়ে কমে আসছে, আমি
অহরহ আর কাউকে প্রশ্নবাণে
বিব্রত করি না।
জানতে চাই না আজকাল
কেবল আমারি কেন পদতলে কেঁপে ওঠে মাটি।

কোথাও ভূকম্পন নেই। তবু কেন
তবু কেন
নগরকম্পনের জের চলতে থাকে
আমার শিরায়।

প্রশ্ন করি না—
যখন নড়ছে ঘর, ইমারত বসে যাচ্ছে
দেয়ালের ফাট
বিশাল হা-এর মত খুলে গিয়ে
মিশে যায় দৃষ্টির আড়ালে,
তোমরা কীভাবে, বন্ধুগণ
খাড়া আছো ?

পৌর-প্রভাবের নীচে মন্ত্রপূত অশথের বীজ
আছে কি না-আছে
আমি আর জানতে চাই না।
কেবল লুতের মত সদোমের সিংহদরোজায়
প্রভু, অনিদ্রায়
আমি যেন থাকি।

নদী তুমি

কে অন্ধকারের পাখি ডানা ঝাড়ো আমার ভিতরে
বেয়াদব শিসে তোর ছলকে ওঠে রক্ত চলাচল ?
নিসর্গের মানচিত্র ছেঁদা করে একদা যে নদী
আনতো গভীর জল কর্মপরায়ণ ঘরে ঘরে
সেও আজ নদী নয়, কালসাপ, ধূর্ত বণিকের
গোপন দালাল যেন। পাটের চালান ভরা নাও
ভাসাও উন্দাম গতি, হাসির গমকে নেড়ে পাল
পাটাতনে ভেঙে পড়ো বিশ্বাসঘাতক নীল জল।

একদিন আমাদের হবে। অজগর এই নদী
হবে জাগর ডাম্বর ঘোলা, হবে চঞ্চল তরল
পেশীতে মচকাবে দাঁড়, পালে আর দড়িতে বিদ্যুৎ।

আজ আমাদের নও, শোষণে ধর্ষণে কালোরেখা।
যেন চোরের সাহায্যকারী তুমি, কবির সন্দেহ;
বোনের শাড়ির মত মায়ের দেহের মত নও !

সত্যের দাপটে

আমাদের এ সংসার সত্য হয়ে ওঠে কি কখনো ?
তবু কেন সত্য সত্য বলা ?
সত্যের দাপটে যেন না ভাঙে এ-ঘরের দেয়াল।

খাটের বিছানাজুড়ে ঘুমিয়েছে যে গরিমা, তার
দ্যাখো চেয়ে বুক দুলছে, নিঃশ্বাসে কাঁপছে দু'টি বুক।
বাহুতে জমেছে ঘাম। কাতানের ওপরে বাতাস
আস্তে উড়িয়েছে পাড়। উরুর প্রান্তরে
একটি তিলের শোভা অনাবৃত হয়েছে দৈবাৎ।
তাকে কি জাগাতে চাও মহত্তম সত্য সংবাদে ?

তাহলে জাগিয়ে দ্যাখো, উঠবে সে চোখে নদী নিয়ে
সত্যের বিদ্যুতে তার ঝলসে যাবে ঘরের পাঁচিল।
একটিমাত্র শিশুর কান্নায়
ছিঁড়ে যাবে টেলিফোন, পাখার ঘূর্ণন
অকস্মাৎ বেড়ে গিয়ে উল্টে দেবে লতাকুঞ্জময়
বৃদ্ধের মস্তকসহ ধাতুর পাখিটি।
আর পাড়ার লোকেরা—
প্রতিবেশী গৃহস্থের ঘরে অকস্মাৎ
সত্যের সৌন্দর্য দেখে
দমকল, দমকল বলে ছুটবে রাস্তায়।

আমি আর আসবো না বলে

আর আসবো না বলে দুধের ওপরে ভাসা সর
চামোচে নিংড়ে নিয়ে চেয়ে আছি। বাইরে বৃষ্টির ধোঁয়া
যেন শাদা স্বপ্নের চাদর
বিছিয়েছে পৃথিবীতে।
কেন এতো বুক দোলে ? আমি আর আসবো না বলে ?
যদিও কাঁপছে হাত তবু ঠিক অভ্যেসের বশে
লিখছি অসংখ্য নাম চেনাজানা
সমস্ত কিছুর।

প্রতিটি নামের শেষে, আসবো না।
পাখি, আমি আসবো না।
নদী, আমি আসবো না।
নারী, আর আসবো না, বোন।

আর আসবো না বলে মিছিলের প্রথম পতাকা
তুলে নিই হাতে।
আর আসবো না বলে
সংগঠিত করে তুলি মানুষের ভিতরে মানুষ।
কথার ভেতরে কথা গেঁথে দেওয়া, কেন ?
আসবো না বলেই।
বুকের মধ্যে বুক ধরে রাখা, কেন ?
আসবো না বলেই।

অথচ স্মৃতির মধ্যে পরতে পরতে জমে আছে
দুঃখের অস্পষ্ট জল। মনে হয় যে নদীকে চিনি
সেও ঠিক নদী নয়, আভাসে ইঙ্গিতে কিছু জল...
যে নারী দিয়েছে খুলে নীবিবন্ধ, লেহনে পেষণে

আমি কি দেখেছি তার পরিপূর্ণ পিঠের নগ্নতা ?
হয়তো জংঘার পাশে ছিল তার খয়েরী জরুল
লেহনলীলায় মত্ত যা আমার লেলিহান জিহ্বাও জানে না।

আজ অতৃপ্তির পাশে বিদায়ের বিষণ্ণ রুমালে
কে তোলে অক্ষর কালো, 'আসবো না'
সুখ, আমি আসবো না।
দুঃখ, আমি আসবো না।
প্রেম, হে কাম, হে কবিতা আমার
তোমরা কি মাইলপোস্ট না ফেরার পথের ওপর ?

আঘ্রাণ

আজ এই হেমন্তের জলদ বাতাসে
আমার হৃদয় মন মানুষীর গন্ধে ভরে গেছে।
রমণীর প্রেম আর লবণসৌরভে
আমার অহংবোধ ব্যর্থ আত্মতুষ্টির ওপর
বসায় মর্চের দাগ, লাল কালো
কটু ও কষায়।

প্রতিটি বস্তুতে দেখি লেগে আছে চিহ্ন মানবীর
হাওয়ায়, জলের ঢেউয়ে, গুল্মের স্তবকে স্তবকে
বইছে নারীর ঘ্রাণ কমনীয় যুগান্তসঞ্চারি।
গণ্ডুষে তুলেছি জল, টলমল—

কার মুখ ভাসে?
কে যেন কিশোরী তুমি আমারি কৈশোরে
নেমেছিলে এ নদীতে। লেগে আছে
তোমারি আতর।

হে বায়ু, বরুণ, হে পর্জন্য দেবতা
তোমাদের অবিরল বর্ষণে ঘর্ষণে
যখন পর্বত নড়ে, পৃথিবীর চামড়া খসে যায়
তবু কেন রমণীর নুন, কাম, কুয়াশার
প্রাকৃতিক গন্ধ লেগে থাকে?

হে বরুণ, বৃষ্টির দেবতা!

স্তব্ধতার মধ্যে তার ঠোঁট নড়ে

আমি জানতাম প্রত্যেক বিজয়ীদের জন্যে থাকে পুরস্কার।
যুদ্ধ ফেরত ক্লান্ত বীরদের পাওনা, পুলকের প্রস্রবণ।
এমন কি আহত, পঙ্গুদের বুকেও সান্ত্বনার পদক ঝলকায়।
আর কে না জানে এসব তাদেরই প্রাপ্য। চিরকালই বীরত্বের
বিনিময়ে এরকম রেওয়াজ রয়েছে।

কিন্তু একজন কবিকে কি দেবে তোমরা ? যে ভবিষ্যতের দিকে
দাঁড়িয়ে থাকে বিষন্ন বদনে ? অঙ্গুলি হেলনে যার নিসর্গও
ফেটে যায় নদীর ধারায়। উচ্চারণে কাঁপে মাঠ,
ছত্রভঙ্গ মিছিল, মানুষ, পাক খেয়ে এক হয়ে যায়।

যখন সে ফেরে দেখো, আচ্ছন্ন উঠোন। সে দেখে
শিশুর শব নিস্পৃহ মায়ায়। সে দেখে ধর্ষিতার শাড়ি
ছিন্নভিন্ন, হত্যায় ছাপানো। স্তব্ধতার মধ্যে তার ঠোঁট নড়ে
ইতিবৃত্ত ভেঙে পড়ে রক্তবর্ণ অক্ষরের স্রোতে।

বোধের উৎস কই, কোনদিকে ?

আচ্ছন্ন চিন্তার মধ্যে স্তব্ধতায় অকস্মাৎ শুনি
সেলাই কলের চলা। পড়শী ঘরণী
বানায় শিশুর জামা।

হঠাৎ গুলির শব্দ। চিৎকার, ধর ধর ধর
কিন্তু আমি কাকে ধরবো ? স্টেনগান কাঁধে নিয়ে হেঁটে যায়
উনিশশো তেয়াত্তর সাল।
বাগান মাড়িয়ে দিয়ে জীপ যায়,
আবার গুলির শব্দ,
মা...মা...মা জানালা বন্ধ করো
টেলিফোন টেলিফোন......
আবার গুলির শব্দ। বাঁচাও বাঁচাও......
বানাও শালাকে ছিঁড়ে ফ্যালো—
ট্যাট্...ট্যাট্...ট্যাট্
খোল্ শালী চোরের চোদানী শাড়ি খোল্......
...ট্যাট্...ট্যাট্...ট্যাট
ছেলে তুই, ছেলে তুই আমার ধর্মবাপ তুই... ..
...ট্যাট্...ট্যাট্ ট্যাট

সেলাই কলের চলা থেমে আছে। সব দরজা বন্ধ করে
জেগে আছি বাতাসের বিরুদ্ধে নীরব। এ-কেমন শিহরণ
গ্রীষ্মকে শীত আর শীতকেও গ্রীষ্ম করে দেয় ?
আমার কি জাড় আছে ? শরীর কি ভিজে গেলো ঘামে ?
বোধের উৎস কই, কোনদিকে ?
আমাকে রাখতে দাও হাত।
একবার স্পর্শ করি শিশ্নে, সহ্যগুণে, প্রেমে।
রক্তের ভিতর দিয়ে একবার দেখা যায় যদি
বিশাল মিনার সেই, যাকে লোকে পুরুষার্থ বলে।

ঊনসত্তরের ছড়া

ট্রাক ট্রাক ট্রাক
শুয়োরমুখো ট্রাক আসবে
দুয়োর বেঁধে রাখ।

কেন বাঁধবো দোর-জানলা
তুলবো কেন খিল ?
আসাদ গেছে মিছিল নিয়ে
আসবে সে মিছিল।

ট্রাক ট্রাক ট্রাক
ট্রাকের বুকে আগুন দিতে
মতিয়ুরকে ডাক।

কোথায় পাবো মতিয়ুরকে
ঘুমিয়ে আছে সে;
তোরাই তবে সোনা-মানিক
আগুন জেলে দে।

কালবোশেখ

যে বাতাসে বুনো হাঁসের ঝাঁক ভেঙে যায়
জেটের পাখা দুমড়ে শেষে আছাড় মারে,
নদীর পানি শূন্যে তুলে দেয় ছড়িয়ে,
নুইয়ে দেয় টেলিগ্রাফের থামগুলোকে;

সেই পবনের কাছে আমার এই মিনতি,
তিষ্ঠ হাওয়া, তিষ্ঠ, মহাপ্রতাপশালী
গরীব মাঝির পালের দড়ি ছিঁড়ে কী লাভ?
কী সুখ বলো গুঁড়িয়ে দিয়ে চাষীর ভিটে?

বেগুন পাতার বাসা ছিঁড়ে টুনটুনিদের
উল্টে ফেলে দুঃখী মায়ের ভাতের হাঁড়ি
হে দেবতা, বলো তোমার কী আনন্দ
কি মজা পাও বাবুই পাখির ঘর উড়িয়ে?

রামায়ণে পড়েছি যার কীর্তিগাথা
সেই মহাবীর হনুমানের পিতা তুমি?
কালিদাসের মেঘদূতে যার কথা আছে
তুমিই যদি সেই দয়ালু মেঘের সাথী—

তবে এমন কঠোর কেন হলে পবন
উপড়ে নিলে লুটিয়ে পড়া ঘরের খুঁটি
কিন্তু যারা লোক ঠকিয়ে প্রাসাদ গড়ে
তাদের কোনো ইট খসাতে পারলে না তো?

হায়রে কত সুবিচারের গল্প শুনি
তুমিই নাকি বাহন রাজা সলোমনের !
যার তলোয়ার অত্যাচারীর কাটতো মাথা
অহমিকার অট্টালিকা গুঁড়িয়ে দিতো।

কবিদের এক মহান রাজা রবীন্দ্রনাথ
তোমার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন করজোড়ে,
যা পুরনো শুষ্ক, মরা অ-দরকারী
কাল বোশেখের একটি ফুঁয়ে উড়িয়ে দিতে।

ধ্বংস যদি করবে তবে শোনো, তুফান!
ধ্বংস করো বিভেদকারী পরগাছাদের;
পরের শ্রমে গড়ছে যারা মস্ত দালান
বাড়তি তাদের বাহাদুরি গুঁড়িয়ে ফ্যালো।